



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 41 - 58

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

বীরাঙ্গনা কাব্যে প্রেম মনস্তত্ত্ব : একটি পর্যালোচনা

ড. নন্দ কুমার পাখিড়া

কলেজ শিক্ষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

কবিকল্পন মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয়, কেশবপুর, হুগলী

Email ID: nandakumar19800@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

প্রেম, নারী, উনিশ
শতক, কবি মধুসূদন,
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা,
বৈচিত্র্যময়তা,
বীরাঙ্গনা।

Abstract

মানবজীবনের ক্রমিক বিকাশধারায় প্রেম তার রূপময় বিচিত্রতা এবং রসময় মাধুর্য নিয়ে উপস্থিত হতে পারে। প্রেমের আরক্ত সংরাগের সাথে সাথে মনোজীবনে তা নিয়ে এল অন্তরঙ্গ ভূমিকা। মৃত্যু অতিক্রমী জীবনের জয়সুভগ গড়ে উঠলো প্রেমের মহিমময় আগ্রহে। প্রেমই মানব জীবনের চিরকালের কাব্য কালোত্তর সংগীত অন্তহীন স্বপ্ন। তবে প্রেমের রূপ বিচিত্রময়। তার গতি প্রকৃতিও বহুধা পথে প্রবাহিত। প্রেমে যেমন মিলনের নিবিড় আনন্দ আছে, তেমনি আছে বিরহের অতলাস্ত মর্মব্যথা। নারীকে কেন্দ্র করেই মূলত বিশ্বের প্রেম সাহিত্য গড়ে উঠেছে। নারীর স্পর্শ-প্রেরণা ও অনুকম্পায় মানুষ প্রেমের রহস্য জগতে প্রবেশের সুযোগ পায়। তবে, উনিশ শতকের কাব্য-কবিতায় নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার কঠোচ্চারণ বারবার শোনা গেছে। পুরুষের তথা সমাজের শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে, স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার স্বাধীনতার জন্য একজন নারী যা কামনা করে তা হল স্বামীর প্রেম, মাতৃত্ব এবং সামাজিক-পারিবারিক ক্ষেত্রে সম্মান প্রতিষ্ঠা। কবি মধুসূদন দত্ত আধুনিক ভাবধারার কবি। তিনি সাম্যবাদের যুগে নারীকে সমানাধিকার তথা স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য কলম ধরেছেন। নারীর ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় তিনি সোচ্চার হয়েছেন। তাই রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী ও চরিত্র বিশেষ করে বিশিষ্ট কয়েকজন নারী চরিত্রকে কবি গ্রহণ করেছেন। তাঁর ‘বীরাঙ্গনা’ কাব্যে। নারী জীবনের বিভিন্ন পর্বে প্রেম যে নানা রূপে-রসে-গন্ধে-বর্ণে নিতাই ছুঁয়ে যায়, তাকে এক বৈচিত্র্যময়তায় কবি তুলে ধরেছেন। সবটা মিলে প্রেমের একটা সামগ্রিকতার রূপ ও পরিমণ্ডল আভাসিত হয়ে উঠেছে ‘বীরাঙ্গনা’ কাব্যের বিভিন্ন পত্রিকাগুলিতে। ‘বীরাঙ্গনা’ বৈধ বা অবৈধ নরনারীর মুক্ত প্রেমের বলিষ্ঠ চেতনায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। উনিশ শতকীয় নবজাগরণের প্রভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী নারী তার স্বমহিমায় বিরাজিত হতে চেয়েছে। যে নারীকে অদৃষ্টে নির্যাতন সহ্য করতে হচ্ছে হৃদয়পাশে বন্দি হয়ে – সেই নারী কবি মধুসূদনের অধিকাংশ কাব্য কবিতায় নায়িকা। ‘বীরাঙ্গনা’ কাব্যে এগারোটি পত্রে এগারো জন নায়িকার প্রেমের যে বিচিত্র গতি প্রবাহিত সেখানে বিষয়বস্তুরও বৈচিত্র্য রয়েছে – কুমারীর তীরু প্রেম, প্রিয়সঙ্গ লাভের জন্য

কামাতুর প্রেম, দাম্পত্য প্রেম, সমাজ বহির্ভূত অবৈধ প্রেম যেখানে কোনো নারী প্রায় উন্মাদিনী
তো আবার কখনো স্বর্গের নারী মর্ত্য মানবের প্রেমে পাগলপারা হয়ে ধরণীতে নেমে এসেছে।

Discussion

প্রেম মানুষের জীবনের শুরু থেকে শেষপর্যন্ত পর্বে পর্বে অঙ্কুরিত, বিকশিত ও স্ফুরিত হয়ে চলেছে; স্তরে স্তরে তার সুখ ও বেদনার পাপড়িগুলিকে মেলে ধরেছে; আমাদের অস্তিত্বের মর্মমূলে প্রেম নিতাই ঝর্ণাধারার মতো প্রবাহিত হয়ে চলেছে। মানবজীবনের ক্রমিক বিকাশধায় প্রেম তার রূপময় বিচিত্রতা এবং রসময় মাধুর্য নিয়ে উপস্থিত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

“প্রেম আমাদের ভিতর হইতে বাহিরে লইয়া যায়, আপন হইতে অন্যের দিকে লইয়া যায়। এক হইতে আর একের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। এইজন্যই তাহাকে পথের আলো বলি। ... পথ চলিতে আর কিছুই অবশ্যক নাই, কেবল প্রেমের আবশ্যক। সকলে যেন সকলকে সেই প্রেম দেয়।”^১

প্রেমের আরক্ত সংরাগের সঙ্গে সঙ্গে মনোজীবনে তা নিয়ে এল অন্তরঙ্গ ভূমিকা। মৃত্যু অতিক্রমী জীবনের জয়স্বস্ত গড়ে উঠলো প্রেমের মহিমাময় আগ্রহে। প্রেম শুধু ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক কোনো উপাদান নয়, প্রেম চলতে ও চালাতে জানে। সংকীর্ণতায় প্রেমের অপমৃত্যু, বহুতত্ত্বে প্রেমের সম্প্রসারণ। প্রেম জীবনের অপরিমেয় প্রত্যাশাকে লালন করে আবার অনিঃশেষ নৈরাশ্যে জীবনকে গ্রাস করে। প্রেম কাউকে করে আত্মপ্রেয়সী, আত্মসচেতন আবার কাউকে করে শূন্যগর্ভ মননচারী। কোনো বিশেষ পুরুষের প্রতি বিশেষ নারীর বা বিশেষ কোনো নারীর প্রতি বিশেষ পুরুষের চিত্ত নিবিষ্ট হলে পারস্পারিক ক্রমনিষ্ঠতা ও অনন্যতার ফলে মিলনাকাজ্ঞার জন্য যে অন্তর্দাহ ও চিত্তব্যাকুলতার প্রকাশ ঘটে। মানবহৃদয়ের সেই অনুভূতিই হল প্রেম।

“প্রেমই মানব জীবনের চিরকালের কাব্য কালোত্তর সঙ্গীত, অশুভীন স্বপ্ন। ... প্রেম জীবনের শর্ত, সকল জ্ঞানের পরিণত সম্পর্ক। যে কাল্মা রিন্ রিন্ করে পাঁজরে পাঁজরে যে আনন্দ নিবিড় হয়ে ওঠে বিকাশের আনন্দে, তাকে ভোলা যায় না।”^২

প্রেমের শারীরিক মানসিক প্রাপ্তি নিয়ে আনন্দবেদনা সাহিত্যে অন্যতম শাশ্বত অবলম্বন।

‘প্রেম’ এই শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ হল - প্রিয় + ইমন্ (ভাঃ) = প্রেমন (১ম ১ বচন) = ‘প্রেম’। এর অর্থ ভালোবাসা, প্রিয়ভাব, সৌহার্দ, স্নেহ। বৈষ্ণব মতে প্রেম হল - ‘কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা’, আবার কালিদাসের ‘রঘুবংশে’ বলা হয়েছে প্রেম পরস্পরাশ্রয়ম, উত্তরমেঘে প্রেম ‘প্রেমরাশীভবন্তি’। ‘ভক্তমাল’ গ্রন্থে বলা হয়েছে প্রেম হলো ‘যুবক যুবতীর ধবংসরহিত ভাব বন্ধন’। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন - ‘প্রেমের পথ নম্রতার পথ’।

তবে প্রেম বড় জটিল, প্রেমের বিচিত্রময় রূপ। তাই তার গতিপ্রকৃতিও বহু পথে প্রবাহিত। সামাজিক বা বৈধ প্রেম যেমন আছে, তেমন সমাজ বহির্ভূত বা অবৈধ প্রেম যাকে বলা যায় অনৈতিক প্রেম তাও আছে। আবার সবকিছুর উর্দ্বৈ রোমান্টিক প্রেম। প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ‘প্রেম’ তাই বিশেষার্থে ব্যঞ্জনার পরিমণ্ডলে ব্যবহৃত হয়। প্রেমের মূলে কাম বিরাজিত থাকলেও, প্রেম যে কাম নয় তা প্রাচীনকালে যেমন গৃহীত হয়েছিল একালেও তেমনি স্বীকৃত। তাই প্রেমের প্রকাশও নানা রকমের। প্রেমে আছে মিলনের নিবিড় আনন্দ আবার বিরহের অতলাস্ত মর্মব্যথা। আবার কোথাও প্রেম এতই রোমান্টিক যে সেখানে কল্পনার দীপ্তি থাকলেও প্রেমের আরক্ত সংরাগের সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনুচ্ছটা নেই। প্রেম-অপ্রেম-রোমান্টিক প্রেম-এই সকলের সহবস্থানেই প্রেম তাই পঙ্কজ। এতে যেমন আছে স্বর্গের সুখমা তেমনি আছে নরকের পুতিগন্ধ।

নারীকে কেন্দ্র করেই মূলতঃ বিশ্বের প্রেম সাহিত্য গড়ে উঠেছে। নারী সৌন্দর্যের প্রতীক। নারীর হাত ধরে নারীর স্পর্শ - প্রেরণা ও অনুকম্পায় মানুষ প্রেমের রহস্য জগতে প্রবেশের সুযোগ পায়। তাতে পাওয়া যায় টাটকা হৃদয়ের উত্তাপ। তবে, ঊনবিংশ শতকে কাব্য কবিতায় নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার কঠোচ্চারণ বার বার শোনা গেছে। মধ্যযুগ থেকেই নারী তার আপন মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগিয়েছে। নারী স্বাধীনতা চায়, শুধু প্রেম নয়। নারীর যা কামনা তা

হল – স্বামীর প্রেম, মাতৃত্ব এবং সামাজিক পারিবারিক ক্ষেত্রে সম্মান প্রতিষ্ঠা। প্রেমের মহিমায় মহীয়ান হয়ে শঙ্কাহীন ভাবে নারী প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছে।

“যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায় কিঙ্কিনী -

আমারে প্রেমের বীর্যে কড়ে অশঙ্কিনী।”^৩

কামের উর্ধ্বে প্রেমকে মধুসূদনই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা দেন। স্বাতন্ত্র্যময়ী নারীর পরিচয় সৌন্দর্য ও প্রেমের বীর্য। বীরাজনার প্রতিটি নারীই প্রেমমহিমায় অনন্য সাধারণ হয়ে উঠেছে।

প্রেমে যেমন সুখ আছে, আছে আনন্দ, আছে জীবনের পূর্ণতা, তেমনি আছে সংঘাত। দ্বন্দ্ব, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা। আদিম যুগ থেকে শুরু করে সভ্যতার গোড়াপত্তন থেকেই প্রেম তার আপন মহিমায় বিরাজ করে আসছে নারী ও পুরুষের হৃদয়ের গভীরে। আর সেইসব প্রেম ভালোবাসা কখনো কাব্যে আবার কখনো বা গদ্যে স্থান পেয়েছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি, লেখকদের সৃজনশীল লেখায় ও রেখায়।

মধুসূদন দত্ত আধুনিক যুগ এবং ভাবধারার কবি হয়েও প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কাব্য কাহিনিকে অবহেলা করেননি। তাঁর প্রায় অধিকাংশ কাব্য কবিতাই (প্রহসনগুলি বাদ দিলে) রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ভাগবত প্রভৃতির কাহিনি অনুসরণে রচিত। ‘বীরাজনা’ কাব্যের পরিকল্পনা এবং বিশিষ্ট কয়েকজন নারীর চরিত্রও কবি উপরোক্ত জায়গা থেকে গ্রহণ করেছেন। তবে তিনি চরিত্র এবং কাহিনিকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছেন এই যা তফাৎ। কবি আক্ষরিক অর্থে প্রেমের কবিতা বা কাব্যরচনা না করলেও তাঁর ‘বজ্রাঙ্গনা’ ও ‘বীরাজনা’ কাব্যে পাশ্চাত্য আদর্শের প্রেম কবিতার আভাস সূচিত হয়েছে। নারী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রেম যে নানা রূপে – রসে – গন্ধে – বর্ণে ও পরিপ্রেক্ষিতে নিত্যই ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়, তাকে এক বৈচিত্র্যময়তায় তুলে ধরেছেন কবি। সমস্ত মিলে প্রেমের একটা সামগ্রিকতার রূপ ও পরিমণ্ডল আভাসিত হয়ে উঠেছে ‘বীরাজনা’ কাব্যে। কবি মানবীদের নিত্য অভিমানে সনাতনী গতিভঙ্গিমা ও পদচিহ্নগুলিকে চিরকালের ভাষায় চিত্রিত করেছেন।

কবি মধুসূদন পুরুষ হয়েও ‘বীরাজনা’ কাব্যে নারীর হৃদয়ের প্রেম বেদনা যাতনা, সুখানুভূতি দুঃখানুভূতিকে যে তুলনামূলকভাবে অধিকতর গভীর দ্যোতনায় ব্যক্ত করতে পেরেছেন, তা অসাধারণ ও অনন্যলভ্য। প্রেমের বিচিত্র গতিপ্রকৃতির হাত ধরে এই কাব্যে কবি প্রেম – অপ্রেমের কাহিনি চিত্রায়িত করেছেন। ‘বীরাজনা’ বৈধ বা অবৈধ নরনারীর মুক্ত প্রেমের বলিষ্ঠ চেতনায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। উনিশ শতকীয় নবজাগরণের প্রভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নারী তার স্বমহিমায় বিরাজিত হতে চেয়েছে।

“রেনেসাঁসের আলোকে উজ্জীবিত হয়ে নারী নিজেকে নতুন করে দেখলো এবং চিনলো। পুরুষের কারাগারে বন্দী হয়ে নারী অবলা এবং ব্যক্তিত্বহীনা হয়ে রইলো না। নারীর অধিকার নিয়ে সে জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করতে চাইলো। জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তার কণ্ঠ থেকে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বানী বারে পড়লো।”^৪

প্রেমের তৃষ্ণা, দ্বন্দ্ব, নারীর প্রতি বিমুগ্ধ সৌন্দর্যের আলপনা, যৌবন সঙ্গিনী পত্নীর স্বামী প্রেমস্মৃতি, পরস্পরের প্রণয় সমন্ধে হৃদয়ের আকর্ষণ ও সামাজিক নীতি শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্যের দ্বন্দ্ব-অনুযোগ – প্রত্যাখ্যান আবার কোথাও সনাতন দাম্পত্য প্রেম প্রকাশিত হয়েছে। যে নারীকে অদৃষ্টের নির্যাতন সহ্য করতে হচ্ছে হৃদয়পাশে বন্দি হয়ে – সেই নারী মধুসূদনের অধিকাংশ কাব্য কবিতার নায়িকা। বীরাজনার সমস্ত নারী চরিত্রগুলিই অদৃষ্টের ফাঁসে বা প্রেমের জালে বন্দি হয়ে উঠেছে।

‘বীরাজনা’ কাব্যে এগারোটি পত্রে এগারো জন নায়িকার প্রেমের যে বিচিত্র গতি প্রবাহিত সেখানে বিষয়বস্তুরও বৈচিত্র্য রয়েছে - কুমারীর ভীরা প্রেম, কেউ কামাতুর হয়ে পড়েছে প্রিয়সঙ্গলাভের জন্য, দাম্পত্য প্রেমে কেউ বা দুর্বল, স্বামীকে বাক্যবানে জর্জরিত করেছেন, আবার বহির্ভূত অবৈধ প্রেমে কোনো নারী উন্মাদিনী, আবার কখনো বা স্বর্গের নারীরা মর্ত্য মানবের প্রেমে পাগলপারা হয়ে মর্ত্যে নেমে এসেছে। আবার কোথাও বা কবি “ভারতীয় নারীর গৃহচারিণী কল্যাণী পতিব্রতা মূর্তিকেই অপূর্ব শ্রদ্ধার সঙ্গে” চিত্রায়িত করেছেন। (দ্বারকানাথের প্রতি রুঙ্কিনী) আবার কোথাও “ভারতীয় নারীর কামান্বিতার” ছবি এঁকেছেন। (সোমের প্রতি তারা)

‘বীরাঙ্গনা’ কাব্যের এগারোটি পত্রিকায় এগারো জন নায়িকার বৈচিত্র্যময় প্রেমকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে প্রতিটি পত্রিকাই বিষয়বস্তুর দিক থেকে স্বতন্ত্র। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা তাই পত্রিকাগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেব। উল্লেখ্য, মধু কবির জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ‘বীরাঙ্গনা’ কাব্যের এগারোটি পত্রিকাকে ভাবানুযায়ী চারটি ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। সেগুলি হল -

ক) প্রেম পত্রিকা : এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হল উর্বশী, রুগ্মিনী, তারা ও সুপর্ণখার পত্র।

খ) প্রত্যাখান পত্রিকা : এর অন্তর্ভুক্ত দেবী জাহ্নবীর পত্র।

গ) স্মরণার্থ পত্রিকা : শকুন্তলা, দ্রৌপদী, ভানুমতী ও দুঃশলার পত্র এর অন্তর্গত।

ঘ) অনুযোগ পত্রিকা : কেকয়ী এবং জনার পত্র এই শ্রেণীভুক্ত।

তবে এই শ্রেণী বিভাগটি যোগীন্দ্রনাথ বসু কাব্যের নায়িকাদের বর্হিমুখী অবস্থার ঐক্যের উপর ভিত্তি করে করেছিলেন। প্রতিটি চরিত্র “পারস্পরিক অন্তর্মুখী সূক্ষ্ম-পার্থক্যের ভেতর দিয়ে যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা রক্ষা করে থাকে”। তা এই ধরণের বিভাজনে স্বীকৃতি পায় না। তাই আলোচনার সুবিধার্থে যোগীন্দ্রনাথ বসুর শ্রেণীকরণ প্রধানতঃ গ্রহণ করা হলেও প্রতিটি পত্রিকার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে প্রতিটি অধ্যায়েরই একটি করে নামকরণ করা হয়েছে। কেননা কোনো কোনো পত্রিকা বিষয় বৈচিত্র্যে বা কোনো কোনো নায়িকা প্রেম নিবেদনে সমগোত্রীয় হলেও অন্তর প্রকৃতি মূল্যায়নের দিক থেকে তাঁদের মধ্যে কোনো মিল পাওয়া যায় না। তাই ‘বীরাঙ্গনা’ কাব্যের প্রতিটি অধ্যায়ে প্রতিটি নায়িকাই স্বতন্ত্র প্রেমের অধিকারিনী।

দুঃস্বপ্নের প্রতি শকুন্তলা : বিরহ বিচ্ছেদেও প্রেম অন্তঃশীলা— পত্রিকা শুরুর প্রথমেই শকুন্তলা নিজেকে দাসী সম্বোধন করে রাজা দুঃস্বপ্নকে প্রণাম জানিয়েছে। সাথে সাথে তার বিরহ বেদনার কথা ব্যক্ত করে বলেছে যে রাজা তাকে ভুলে গেলেও সে কিন্তু রাজার পথ চেয়েই বসে আছে। পুনর্মিলনের আনন্দোচ্ছ্বাস শকুন্তলাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এখানে দেখা যায় যে দুঃস্বপ্ন একই সঙ্গে স্বামী এবং প্রেমিক। আর এই প্রেমের মধ্যেই মধুসূদন নতুনত্বের স্বাদ এবং পরিণত প্রেমের তীব্রতা, গাঢ়ত্ব দেখিয়েছেন। শকুন্তলা ভেবেছে কোন এক শুভ লগ্নে স্বপ্নের অতিথি হয়ে প্রেম তার দুয়ারে এসেছিল। আজও সে সেই প্রেমের বিরহ জ্বালা সয়ে বেড়াচ্ছে। তার প্রেমে একদিকে যেমন স্বচ্ছতা, পবিত্রতা রয়েছে, রয়েছে মুগ্ধতা অপর দিকে তেমনি বিরহ বেদনার ধারা প্রবাহিত হয়েছে। প্রেমের মধুর স্মৃতিকে অবলম্বন করে সে স্বামীর কাছে পৌঁছতে চেয়েছে। তার প্রেম ‘মিলনে মধুর বিরহে বিধূর’ হয়ে উঠেছে। আকুল আবেগ, ব্যথিত হৃদয়ে তার প্রাণ বারবার দয়িতের দিকে ছুটে গেছে। শকুন্তলা সদা সচকিত - এই বুঝি তার বিরহের অবসান হয়। আনন্দে তার হৃদয় কেঁপে ওঠে -

“ভ্রান্তি মদে মাতি ভাবি পাইব সত্বরে

পাদপদ্ম! কাঁপে হিয়া দুরদুর করি

শুনি যদি পদশব্দ!”

শকুন্তলার মধ্যে মিশে আছে এক অপূর্ব প্রেমিকা সত্তা - যার মধ্যে প্রিয় মিলনের জন্য ব্যকুলতা, স্বপ্ন, বিরহ এবং বর্তমান সময় জড়িয়ে আছে। একদিক থেকে মধুসূদন এক অপূর্ব আকর্ষক রীতি-পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। শকুন্তলা ধন-ঐশ্বর্য কোনো কিছুই চায় না। সে শুধু চায় স্বামীর পদসেবা করতে। তাতেই তার জীবন সার্থক, তার একটাই প্রার্থনা -

“নাহি লোভে দাসী বিভব সেবিবে

দাসী ভাবে পা দুখানি এই লোভ মনে -”

বনবাসিনী শকুন্তলা রাজা দুঃস্বপ্নের কাছে শুধু একটুকু ভালোবাসা পেতে চায়। অতীতে সে নির্জন অঙ্গনে তাদের প্রেমের পূর্বরাগ সঞ্চারিত হয়েছিল, যার পরিণতি গান্ধর্ব বিবাহ, আজকে মনে পড়েছে সেই নির্জন আলাপনের কথা। স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে বর্তমান সময়ে সে প্রেমকে বাঁচিয়ে রেখেছে। শকুন্তলার মধ্যে প্রেমিকা সত্তার নানা বর্ণচ্ছটা বিচ্ছুরিত হতে দেখা যায় এর মধ্যে দিয়ে। নানা ধরণের শব্দ (ধূলার বাড়, পাতার মর্মধ্বনি, নদীর কুলুকুলতান প্রভৃতি) শকুন্তলার

স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাদের গান্ধর্ব বিবাহের ফুলশয্যার কথা, নিকুঞ্জবনে ফুলশয্যা বিছানোর কথা স্মরণ করে, সেই মধুর স্মৃতি জাগিয়ে রেখেই শকুন্তলা বিধাতাকে একপ্রকার ধিক্কার জানিয়েছে -

“হে বিধাতঃ, এই কি রে ছিল তোর মনে?

এই কি রে ফলে ফল প্রেমতরু শাখে?”

সাথে সাথে শকুন্তলার মনে প্রেম সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছে একি মনের ভুল, প্রেম তবে পূর্ণতা পায় না? প্রেমের ফল কি তবে কেবল বিরহ বেদনা? তাই বারবার শকুন্তলা স্বপ্ন দেখেছে আবার পরক্ষণেই অনিশ্চয়তায় সেই স্বপ্ন ভেঙে গেছে। শকুন্তলার মধ্য দিয়ে মধুসূদন একই সঙ্গে স্বপ্নদর্শন ও স্বপ্নভঙ্গের ছবি এঁকেছেন। কবিতার শেষের দিকে দেখা যায় যে, শকুন্তলা নিজের জন্ম এবং প্রতিপালন নিয়ে নিজেকে ‘চির অভাগিনী আমি!’ বলেছে, যদিও জীবনে সে সুখের সন্ধান পেয়েছিল তাও হারিয়ে যেতে বসেছে। সীমার মাঝে অসীমের হাত ধরতে গিয়ে তা বারেবারেই অধরা থেকে যায়। তার প্রাণ - পাখিকে রাজা দুঃস্বপ্ন প্রেমশরে জর্জরিত করেছে, কিন্তু তাতে তার প্রেমের পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। তাই শকুন্তলা বলেছে -

“এ মনে যে সুখ পাখী ছিল বাসা বাঁধি,

কেন ব্যাধবেশে আসি বধিলে তাহায়,

নরাধিপ?”

শকুন্তলার মধ্যে অপরিণত এবং প্রথম প্রেমের ভীতি, সঙ্কোচ ও লজ্জা যেমন আছে, আবার বিরহ কাতর জীবনে প্রেমের পূর্ণতার সন্ধানে তার প্রেমের গাঢ়তা ফুটে উঠেছে। সে আত্মসমর্পিতা হয়েছে। নদীতে ভেসে যাওয়া মানুষ যেমন একটুকরো কাঠকে দেখে বাঁচতে চায়, শকুন্তলারও তেমনি অবস্থা। পত্রিকার স্তরে স্তরে রোমান্টিক প্রেমের এক বিষন্নতার সুর ধ্বনিত হয়েছে। বহুপত্নীক স্বামী শকুন্তলাকে ভুলে গেলেও শকুন্তলা স্বামীকে বিস্মৃত হতে পারেনি। নারীর শাস্ত্র ধর্মের উপলব্ধি তার মধ্যে ছিল। পত্নী সুলভ আত্মবিশ্বাসের উপর ভর করে সে সর্বদা স্বামীর আগমন প্রত্যাশা করেছে। তার প্রেমের অভিব্যক্তির মধ্যে অসহায়তা ভাব জেগে উঠেছে। শকুন্তলার মন বারে বারে শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। পত্রিকার শেষে শকুন্তলা লিখেছে, সে বনবাসী, রাজ অন্তঃপুরে তার প্রবেশ ঘটবে কিনা সন্দেহ? তবুও সে আশা ত্যাগ করেনি -

“বনচর চর, নাথ! না জানি কি রূপে

প্রবেশিবে রাজপুরে, রাজ সভাতলে?

কিন্তু মাজ্জন জন, শুনিয়াছি, ধরে

তুণে, আর কিছু যদিনা পায় সম্মুখে!

জীবনের আশা, হায়, কে ত্যাজে সহজে!”

এই ছত্রগুলিতে স্বামী বিরহিনী পত্নীর দীর্ঘশ্বাস জড়িয়ে আছে। স্বপ্নভঙ্গ হলেও সে তখনো আশায় বুক বেঁধে আছে। বারবার সে আশাহত হয়েছে। তবুও সে গর্বে, গরিয়সী, মহিয়সী হয়ে উঠেছে। নারী হৃদয়ের তীব্র উৎকর্ষা, স্বামীর প্রতি অনুযোগ অপূর্ব কাব্য সুসমায় আলোচ্য পত্রিকায় ফুটে উঠেছে। পত্রিকাটিকে শকুন্তলার প্রেম মধুর ও করুণ হয়ে উঠেছে একই সাথে।

সোমের প্রতি তারা : মিলনে মধুর বিরহে বিধুর— সোমের প্রতি তারার পত্রিকাকে একটি আদর্শ প্রেম পত্রিকা বলা যেতে পারে। নবজাগ্রত প্রেম পূর্বরাগের লজ্জা, বিনম্র ভঙ্গিমায় যখন অন্যের কাছে তথা প্রিয়জনের কাছে প্রকাশিত হয় সেই বিষয় অবলম্বনকারী পত্রই হল আদর্শ প্রেমপত্র। মনে রাখা প্রয়োজন যে, পুরাণে যেভাবে সোমদেব এবং তারার প্রেমকাহিনি লিপিবদ্ধ আছে মধুসূদন কিন্তু ঠিক তার বিপরীত চিত্র অঙ্কন করেছেন। পুরাণে দেখা যায় সোমদেব গুরুপত্নীকে প্রেম নিবেদন করেছিলেন। কিন্তু মধুসূদন দেখিয়েছেন দেবগুরু বৃহস্পতি পত্নী তারা সোমদেবকে তার গোপন প্রেমের কথা পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছেন। দুটিই অনৈতিক, সমাজ নিষিদ্ধ প্রেম।

কিন্তু প্রেমের আকুলতাকে তারা চেপে রাখতে পারেনি। প্রেমের আবেগে সমাজ - সংসার, সতীধর্ম সমস্ত কিছুকে জলাঞ্জলি দিয়ে সোমদেবের রূপে বিমুক্ত হয়ে প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েছেন তারা। তাই তারা গুরুপত্নী হয়েও সোমদেবের চরণসেবা করতে চেয়েছেন।

“...গুরুপত্নী আমি

তোমার, পুরুষরত্ন, কিন্তু ভাগ্যদোষে

ইচ্ছা করে দাসী হয়ে সেবি পা দুখানি।”

এটা যে পাপ, অন্যায় তাও তারা জানে, কিন্তু সমস্ত ভয়, পাপ, ধর্ম কুলমর্যাদাকে সে প্রেমের প্রবল জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছে। তার মন সতীত্ব ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রেমসাগরে ডুবতে চেয়েছে। তাই তিনি -

“...কুকর্মে রত দুর্মতি যেমতি

নিবায় প্রদীপ, আজি চাহে নিবাইতে

তোমায় পাপিনী তারা।”

আবার কোথাও বলেছে -

“এস তবে, প্রাণ সখে, দিনু জলাঞ্জলি

কুলমানে তব জন্যে, - ধর্ম, লজ্জা, ভয়ে!”

সমাজের চোখে এটা অপরাধ জেনেও ‘তারা’ নিজেকে সংযত রাখতে পারেনি। কামনার প্রবল স্রোতে সে ভেসে চলেছে।

“দেবগুরু বৃহস্পতির সঙ্গে তারাদেবীর বয়সের ফারাক ছিল অনেক। তারার নব যৌবন। সামনে দেখেছেন রূপের সাগর সোমকে। দেহে অসীম পিপাসা। সামনেই সাগর। অথচ সে জলপান করার অধিকার নেই তারার। তার যদি অধিকার না থাকে, তবে রাখা কোন্ অধিকারে কৃষ্ণরূপ সাগরের জলপান করেছেন? শতসহস্র প্রশ্ন ঘুঁন পোকাকার মতো কুরে কুরে খেয়ে চলল তারাকে। সমাজজীবনেও প্রতিনিয়ত তখন ভোগ ও ত্যাগের দ্বন্দ্ব চলছে। তারা জানেন তিনি পাপ করছেন। তবু সোমরূপ কলঙ্কের যার কর্তে ধারণ করেই তারা সুখী হতে চান। পুরুষশাসিত সমাজের কারাগার ভেঙে স্বাধীন জগতে বিচরণ করতে চান।”^৫

সমস্ত পুরানো স্মৃতি ভেসে উঠেছে তারার। সেই স্মৃতিমালাকে প্রেমের রঙে রাঙিয়ে নিতে চেয়েছে। গুরুগৃহে সোমের প্রতিটি পদক্ষেপ তারার মনে প্রেমভাব জাগ্রত করত। গুরুপত্নী রূপে সোমদেব যখন তারাকে প্রণাম করতো তখন তার মনে হত সোমদেব যেন তারার মান ভাঙানোর জন্য এমন করছে এবং তারা মনে মনে সেটাকে আর্শীবাদ স্বরূপে নমস্কার করতেন -

“আর্শীবাদ ছলে নিমতাম আমি।”

সমাজের চোখে তারার এই প্রেম নিষিদ্ধ প্রেম। আবার ‘তারা’র এই প্রেমের কথা শুধু তো সে নিজেই জানতো তাই এ প্রেম গুপ্ত প্রেমের পর্যায়ে পড়ে। মধুসূদন এই ছবিকে নিয়ে একটি রোমান্টিক প্রেমের চিত্র অঙ্কন করতে চেয়েছেন। রোমান্টিক প্রেমের দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে লজ্জা ও সঙ্কোচের মধ্যে থেকেও এটি একটি আদর্শ প্রেমের কবিতা এবং আদর্শ প্রেমপত্র হয়ে উঠেছে। ‘তারা’র মধ্যে লজ্জা, সঙ্কোচ, পাপাচারের ভয়, দ্বিধা-সংশয় থাকলেও তার মধ্যে প্রেমের আকুল উচ্চতার উত্তাপ পাওয়া যায়। সমাজের সমস্ত বাধাকে এবং নিয়মনীতির বন্ধনকে ছিঁড়ে তারা তাঁর প্রেমকে বাঁচাতে চেয়েছে এবং সেই প্রেমকে অবলম্বন করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চেয়েছে। সমস্ত লাঞ্ছনা, অপমান, ধিক্কারকে সহ্য করেও ‘তারা’ তার প্রেমকে ত্যাগ করেনি। এখানেই ‘তারা’ প্রেমে মহিয়সী হয়ে উঠেছে।

সমাজ নিষিদ্ধ, অনৈতিক প্রেম হলেও এই প্রেমকে কোনোমতেই উপেক্ষা করা যায় না। এখানে নারীমুক্তির চেতনার আভাস পাওয়া যায়। বর্তমানে নারী স্বাধীনতা নিয়ে যে আন্দোলনের কথা শোনা যায়, ‘তারা’র কর্তেও যেন সেই সুর লক্ষিত হয়েছে। নারী জাগৃতি চেতনা যেন বিকশিত হয়েছে। সমাজ সংস্কারকে উপেক্ষা করে একা নারী ‘তারা’ তার প্রেমের জয়কে ঘোষণা করতে ব্যকুল হয়েছে। ‘প্রেম’ তা সে যেমন হোক না কেন তা যেন কোনোভাবেই উপেক্ষণীয় না

হয়, তা মধুসূদন বোঝাতে চেয়েছেন। সমস্ত সংস্কারের গণ্ডিকে অতিক্রম করে ‘পিঞ্জরবদ্ধ পাখী’ রূপে না থেকে বনের পাখী হয়ে ‘তারা’ তার প্রেমের জয়গান গেয়ে বলেছেন –

“...প্রেম উদাসীনি

আমি! যথা যাও যাব, করিব যা কর, -

বিকাইব কায় মনঃ তব রাঙা পায়ে!”

আবার বলেছেন –

“এ নব যৌবন, বিধু, অর্পিব গোপনে,

তোমায়, গোপনে যথা অর্পেন আনিয়া

সিন্ধু পদে মন্দাকিনী স্বর্ণ, হীরা মণি?”

তাই সমস্ত কিছুর উর্দে উঠে ‘তারা’ তার প্রেমে গরবিনী হয়ে উঠেছেন। তাঁর জীবন মরণ সবই সোমের হাতে সঁপে দিয়েছে – “জীবন মরণ মম আজি তব হাতে।”

দ্বারকানাথের প্রতি রুকিণী : এবার আমায় তোমার করে নাও— এই পত্রিকায় কুমারী হৃদয়ের লজ্জা, গোপন প্রেমের আড়ষ্টতা ফুটে উঠেছে। কুমারী রাজকুমারী রুকিণী দ্বারকানাথের বাল্য কৈশোর যৌবনের সমস্ত লীলার কথাই জানেন। তিনি তাঁকে কোনো এক নিশীথ স্বপ্নে দেখেছেন। আর সেখান থেকেই সেই না দেখা প্রেমিকের প্রতি সমাজ প্রেমের গাঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে। স্বপ্নে দেখা সেই পুরুষরত্নকে ভালোবেসে রুকিণী তার দেহ মন সমর্পন করে বসে আছেন। প্রথম প্রেমোচ্চারণের লজ্জা ও দ্বিধা, ধীরে ধীরে সেই লজ্জা ও সংকোচের অন্তর্ধান, প্রেমের গাঢ়তা, প্রিয় মিলনের আকাঙ্ক্ষাই একমাত্র কামনা হয়ে উঠেছে। রাজকুমারী রুকিণী তাঁর ভাইয়ের দেখা পাত্রকে বিবাহ করতে চান না, সে কথা তিনি তাঁর মাতাকেও বলতে পারেননি। তিনি ‘কায়মনো’ বিকিয়ে বসে আছেন স্বপ্নে দেখা পুরুষরত্নটিকে। তবুও যখন ঘোর সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে, তখন তিনি স্বপ্নে দেখা মনের মানুষকে পত্র লিখেছেন তাকে হরণ করার জন্য, জীবনরক্ষা করার জন্য। উল্লেখ্য, না দেখা একজন মানুষ, তাকে পত্র রচনা এবং প্রেম নিবেদন বড় লজ্জার বিষয়। কিন্তু প্রেম মানুষের লজ্জা – সংকোচ – ভয়কে ভুলিয়ে দেয়। রুকিণীও প্রেমের লজ্জা, আড়ষ্টতা তাগ করে প্রেমিকপুরুষকে পত্র লিখেছেন। লিরিক ধর্মী কবিতার মধ্যে দিয়ে কুমারী প্রেমের আকুলতা অনন্ত প্রেমের ঐশ্বর্য মধুসূদন যথার্থ ভাবেই সৃষ্টি করেছেন –

“আইস, মুরারি,

আইস, বাহন তব বৈনতেয় যথা

হরিল অমৃতরস পশি চন্দ্রালোকে

হর অভাগীরে তুমি প্রবেশি এদেশে।”

দশরথের প্রতি কেকয়ী : প্রতিবাদে ও অনুরাগে— রামায়ণের ঘটনা অবলম্বনে রচিত এই পত্রে রামায়ণের পুরাণ ভূমিতে সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি - “কেকয়ীর অভিযোগ নব যুক্তিবাদের ভিত্তিতে গঠিত।” এই পত্রে বিবাহিত জীবনের চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে, কিন্তু তা অভিযোগে পরিপূর্ণ। রাজা দশরথ তাঁর প্রতিজ্ঞা রাখতে পারেননি রাণী কেকয়ীর কাছে। রাণী কেকয়ীর প্রেমকে রাজা দশরথ প্রতারণা করেছেন। তাই রাণী কেকয়ী রাজার বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ করেছেন। স্বামীর কৃতকর্মের জন্য অন্যের কাছে উপহাস্যস্পদ করে তোলার চেষ্টা করেছেন। তীব্র ব্যঙ্গের কশাঘাতে, ঝাঁঝালো মন্তব্যে স্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ও সত্যভঙ্গের কথা বিবৃত করেছেন। প্রেমের আবেগে গা না ভাসিয়ে স্বামীর তীব্র সমালোচনা করেছেন, করেছেন প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদ ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীজাগৃতির নব যুক্তিবাদের ভিত্তিতে গঠিত।

একদা রাজা দশরথ রাণী কেকয়ীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করেন এবং দাম্পত্য সন্তোষে লিপ্ত হন। সে সময় তিনি রাণী কেকয়ীর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে রাণী কেকয়ীর পুত্রকেই তিনি সিংহাসনে বসাবেন। কিন্তু রঘুকুলপতি অসত্যাচারণ করেছেন রাণী কেকয়ীর সঙ্গে। রাজা দশরথ তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে রাণী কৌশল্যার পুত্র রামচন্দ্রের অভিষেকের

আয়োজন করেছেন। অযোধ্যা নগরী তাই উৎসব মুখরিত। এই বিশ্বাসঘাতকতা, এই প্রতারণা রাণী কেকয়ীর কাছে দুঃসহ যন্ত্রণায় পরিণত হয়েছে। তাই তিনি আর চুপ করে থাকতে পারেননি। এতদিন স্বামীর প্রতি যে প্রেম ছিল তা প্রতিশোধ স্পৃহায় পরিণত হয়েছে। প্রতারক, অসত্যবাদী স্বামীকে অভিযুক্ত করে নিজের মনের জ্বালা নিবারনের জন্য কেকয়ী তাই সরাসরি বলেছেন -

“অসত্যবাদী রঘুকুলপতি!

নির্লজ্জ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙ্গেন সহজে।

ধর্ম শব্দ মুখে। - গতি অধর্মের পথে!”

রাণী কেকয়ী এখানে রাজা দশরথকে একজন কামাসক্ত, নারী দেহভোগী ব্যক্তিত্বহীন রাজবরূপে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। রাণী কেকয়ী যৌবনে অতুলনীয় রূপবতী ছিলেন, যেকোনো পুরুষকে আকর্ষিত করবার মত যৌবন তাঁর ছিল। আর সেই রূপের মোহে এবং দেহজ কামনার চৌম্বক আকর্ষণে রাজা দশরথ কেকয়ীর কাছে ছুটে গিয়ে ছিলেন। রাণী তীব্র ব্যঙ্গের মাধ্যমে সেই কথা রাজাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন -

“না পড়ি চলিয়া আর নিতম্বের ভরে!
 নহে গুরু উরু - দ্বয়, বর্জুল কদলী
 সদৃশ! সে কটি, হায়, কর পদ্মে ধরি
 যাহায়, নিন্দিতে তুমি সিংহে প্রেমাদরে,
 আর নহে সরু, দেব! নম্র শিরঃ এবে
 উচ্চ কুচ! সুধা - হীন অধর! লইল
 লুটিয়া কুটিল কাল, যৌবন ভাঙরে
 আছিল রতন যত ...”,

যেদিন এই রূপ রাণীর ছিল সেদিন নানা আশার বানী নিয়ে রাজা ‘কাম - মদে’ মেতেছিলেন। কিন্তু রাজা সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি, সত্যধর্ম পালন করেননি। রানী তাই তীব্র ধিক্কার জানিয়ে বলেছেন -

“কামীর কুরীতি এই শুনেছি জগতে,
 অবলার মনঃ চুরি করে সে সতত
 কৌশলে, নির্ভয়ে ধর্মে দিয়া জলাঞ্জলি” -

রাণী স্বামীর কৃতকর্মে এতটাই ক্ষুব্ধ যে তিনি দেশ-দেশান্তরে স্বামীর এই পাপাচারের, অধর্মের কথা প্রচার করে বেড়াবেন -

“দেশ দেশান্তরে

ফিরিব, যেখানে যাব, কহিব সেখানে

‘পরম অধর্মাচারী রঘু - কুল -পতি!’”

রাণী জানেন যে নদীর শ্রোতকে কখনো ফেরানো যায় না। তাই পত্রিকার শেষে রাণী রাজাকে অভিশাপ দিয়েছেন -

“থাকে যদি ধর্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
 এ কর্মের প্রতিফল! ...”

আসলে “নারী নিছক পণ্য নয়। আত্মমর্যাদা বোধ তার প্রখর তাই সে কেবল পুরুষের ভোগের পাত্র হতে রাজি নয়। পুরুষ তার ইচ্ছামত ভোগকামনা চরিতার্থ করে নারীকে নিষ্ফল করবে অবজ্ঞার ডাস্টবিনে, এই অন্যায় মেনে নেওয়া আলোকপ্রপ্তা নারীর পক্ষে অসম্ভব। নারী চায় ভালোবাসা পুরুষের একগ্রামিতা এবং আজীবন বীরপ্রকৃত প্রেমিকের সঙ্গ ও অসঙ্গ। যেখানে পুরুষ নারীকে এই মর্যাদাটুকু দিতে অস্বীকার হয় সেখানেই তো নারী হয়ে ওঠে জন্য। এই পত্রে কেকয়ী ও হয়ে উঠেছে পন্য।”^৬ একজন নারী কতখানি স্বামীর প্রতি ক্ষুব্ধ হলে এরূপ কথা বলতে পারেন তা সহজেই অনুমেয়। তাই সেই নারীর মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহার আগুন জ্বলে উঠেছে। যেন নিজের রক্তে লেখা এই পত্রিকা। বার বার রাণী স্বামীর বিরুদ্ধে

যে অভিযোগ জানিয়েছে তা হল প্রতিজ্ঞাভঙ্গের বা সত্যভঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযোগ। রাণীর যৌবনকে ভোগ করে সুকৌশলে রাজা দশরথ তাঁকে প্রতারিত করেছেন। এটা কোনমতেই রাণী সহ্য করতে পারছেন না। তাই তাঁর এই মানসিক জ্বালা নিবারনের জন্য তিনি রাজাকে অভিশাপও দিয়েছেন।

তবে, রাণীর মধ্যে রাজা দশরথের জন্য যে প্রেম ছিল তা এখনো অবশিষ্ট আছে। পত্রিকার বিভিন্ন অংশে তা দেখা যায়। রাণীর যে ক্ষোভ, যে অভিমান তা প্রেমেরই উল্টো পিঠ। রাণীর মনের কেন্দ্রবিন্দুতে রাজা দশরথের প্রতি অনুরাগ বিদ্যমান, আর এই অনুরাগকে ভিত্তি করেই রাণী এত কথা বলেছেন। স্বামীর দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনে স্বামীকে বাধ্য করার পিছনে প্রেমের সুতীর দাবীই কাজ করেছে। পত্রিকার ছত্রে ছত্রে যে রাণীর অভিমানের যে সুর শোনা যায় তার পিছনে যে প্রেমই সক্রিয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রাণীর মনের সেই প্রেম রাজা দশরথকে বিভিন্ন সম্বোধনের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ স্বামীর ব্যবহারে তিনি পীড়িত হলেও স্বামীর প্রতি প্রেম এখনো তাঁর মনে জাগ্রত। প্রেম এখানে ব্যথায় বাধ্য হয়ে উঠেছে। আর সেই প্রেমের জোরেই তিনি স্বামীকে এত কথা বলতে পেরেছেন। রাণী যেন বলতে চেয়েছেন – “কেন বধুনা কর মোরে/ কেন বাঁধ অদৃশ্য ডোরে।”

লক্ষণের প্রতি সুর্পণখা : যৌবনের মৌবনে— এই পত্রিকায় সুর্পণখার প্রেমাসক্তি ভোগ-সুখ বঞ্চিতা কামলোলুপ নারীর প্রেমোভীষ্মার দর্পন। প্রিয় মিলনের আকাঙ্ক্ষাই সুর্পণখার একমাত্র কামনা। এখানে দেহসর্বস্ব প্রেমের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। সুর্পণখার যে বিকট রূপ দেখি, এখানে সেই রূপ অন্তর্হিত হয়েছে। এখানে সুর্পণখা রাজকুমারী, তিনি অসামান্য সুন্দরী। যৌবনের মৌবনে তিনি বিচরণ করেছেন। এমতাবস্থায় রামানুজ লক্ষণকে তিনি দেখতে পেয়েছেন। কামদেবের থেকেও দেখতে সুন্দর রাজকুমার লক্ষণকে তিনি পত্রিকার মাধ্যমে প্রেম নিবেদন করেছেন। লক্ষণের পরিচয় সংগ্রহ করে তিনি তার মর্মব্যথী হতে চেয়েছেন এবং চিরকাল লক্ষণের পদসেবা করার অনুমতি চেয়েছেন। তবে রাজকুমার লক্ষণকে পাওয়ার জন্য তিনি নিজের রূপের বর্ণনা নিজেই করেছেন। তাঁর দেহসর্বস্ব রূপের কথা জানিয়েছেন। লক্ষণের দেব দুর্লভ রূপ দেখে তার প্রেমে পড়েছেন। আবার লক্ষণের মাথায় জটাভার দেখে তার কণ্ঠে বুক ফেটেছে –

“ফাটে বুক জটাজুট হেরি তব শিরে,

মঞ্জুকেশি!” ...

অচেনা অজানা প্রেমিকের প্রেম মগ্ন হয়ে সুর্পণখা সুখ স্বপ্নের কল্পনার জাল বুনেছেন। প্রেমিকের কাছে দেহ মন সর্বস্ব আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে এক রোমহর্ষক আনন্দ উপলব্ধিতে পৌঁছেছেন। প্রাণসখা লক্ষণের এই অবস্থা কে করেছে তা জানতে চেয়েছেন এবং তাদের শাস্তি দিতে চেয়েছেন। সেনাবাহিনী, অর্থ সবকিছু দিয়ে লক্ষণকে সাহায্য করতে চেয়েছেন। কোন রূপসী যুবতী যদি লক্ষণকে কষ্ট দিয়ে থাকেন তবে মোহিনীমায়া সৃষ্টি করে তার রূপ ধরে লক্ষণের কার্য লাঘব করতে চেয়েছেন। -

“কোন্ যুবতীর নব যৌবনের মধু

বাঞ্ছা তব? অনিমিষে রূপ তার ধরি,

(কামরূপা আমি, নাথ,) সেবিব তোমারে।”

প্রেমে নিঃশঙ্ক, লজ্জাহীনা সুর্পণখা প্রেমের সাধন ও প্রাসাধন দুই দিয়েই লক্ষণকে আপন করতে চেয়েছেন। প্রেমে পাগলপারা সুর্পণখা লক্ষণকে পাওয়ার জন্য সমস্ত রাজ ঐশ্বর্য, ভোগ সুখ, রাজবেশ ত্যাগ করতেও প্রস্তুত –

“রতন কাঁচলি খুলি, ফেলি তারে দূরে,

আবরি বাকলে স্তন, ঘুচাইয়া বেণী,

মন্দি জটাজুটে শিরঃ, তুলি রত্নরাজী

বিপিন জনিত ফুলে বাঁধি হে কবরী!

মুছিয়া চন্দন, লেপি ভস্ম কলেবরে।

পরি রুদ্রাক্ষের মালা, মুক্তামালা ছিঁড়ি

গলদেশে!...”

অর্থাৎ সূর্পণখা লক্ষণের মর্মসহচরী হয়ে উঠতে চেয়েছে। লক্ষণের দুঃখই তাঁর দুঃখ, লক্ষণের সুখেই তাঁর সুখ, তাঁর হৃদয় লক্ষণের প্রেমা ভরপুর। লক্ষণের অনিন্দ্যসুন্দর রূপ তার অন্তরের সুপ্ত প্রেমকে জাগ্রত করেছে, এবং লক্ষণকে অবলম্বন করেই সেই প্রেমের পরিণতি পেতে চায়। তবে সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে সূর্পণখার দেহ পিপাসা।

সমাজ, বংশমর্যাদা, কুল, ধন, ঐশ্বর্য, রাজসুখ সমস্ত কিছু তিনি তাগ করতে চেয়েছেন, কেবল লক্ষণকে পাওয়ার জন্য। তিনি এও বলেছেন যে প্রেমের অধীন কোনো নারীর কাছে এগুলি কোনো বাধাই নয়। তাই লক্ষণকে গুরুপদে বরণ করে সেই গুরুর চরণে তাঁর প্রেমের অঞ্জলি দিতে চেয়েছেন দক্ষিণা স্বরূপ। তাঁর হৃদয়মন্দিরে এবং ‘যৌবন ধন’ গুরুপদে অর্পন করতে চেয়েছেন -

“গুরুর দক্ষিণাঃ-রূপে প্রেম গুরুপদে
দিব এ যৌবন - ধন - প্রেম - কুতূহলে।
প্রেমাধীনা নারীকুল ভরে কি হে দিতে
জলাঞ্জলি, মঞ্জুকেশি, কুল, মান ধনে
প্রেমলাভ লোভে কভু?...”

এখানে ঊনবিংশ শতাব্দীর নারী জাগরণের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। নারী কুল সমস্ত রীতিনীতিকে উপেক্ষা করে প্রেমের বলে বলীয়ান হয়ে তাকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছে। নারীর স্বাধীন ও মুক্ত প্রেম ধ্বনিত হয়েছে। প্রেমের এক সাহসী রূপ ফুটে উঠেছে।

সূর্পণখার হৃদয়ের প্রবল প্রেমোচ্ছ্বাস শরীরী কামনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। তাঁর প্রেমের ভিত্তিই হল সম্ভোগ স্পৃহা -

“আইস ভ্রমর রূপে, না যোগায় যদি
মধু এ যৌবন ফুল, যাইও উড়িয়া
গুঞ্জরি বিরাগ - রাগে! কি আর কহিব?”

তবে কিছু কিছু জায়গায় দেহাতীত সুরও শোনা যায়। লক্ষণের দুঃখে সমব্যথী হয়ে সূর্পণখা রাজসুখ তাগ করতে চেয়েছেন। শেষে সূর্পণখা লক্ষণের কাছে প্রেমভিক্ষা চেয়ে দ্রুত তাঁর কাছে এসে তাঁকে বিবাহ করে তার দেহ মনের জ্বালা নিবারণ করতে বলেছেন।

পত্রিকাটি আদিরসের ফল্গুশ্রোতে রচিত হলেও একটি রোমান্টিক প্রেমের আবেশ লক্ষণীয় তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে সূর্পণখার দেহসর্বস্বতা। তিনি তাঁর রূপ যৌবনকে মূলধন করে প্রেমের পথে অগ্রসর হতে চেয়েছেন। সেই যৌবন সুধার লোভ দেখিয়ে লক্ষণকে কাছে পেতে চেয়েছেন। তিনি যে সকল পুরুষের কামনার তৃপ্তি সাধন করতে সক্ষম তা তিনি বিলক্ষন জানেন। আর তাই লক্ষণকে পরীক্ষা করে তা দেখতেও বলেছেন, যদি তিনি লক্ষণকে তৃপ্ত করতে না পারেন তবে লক্ষণ ফিরে যেতে পারেন -

“গন্ধহীন যদি
এ কুসুম, ফিরে তবে যাইও তখনি।”

দেহপিপাসায় পরিপূর্ণ সূর্পণখা নিজের পরিচয় দিয়েছেন এই বলে -

‘কামরূপা আমি নাথ’।

তবে, সূর্পণখার মধ্যে প্রেমের আন্তরিকতা ছিল, কোনরূপ ছলনা ছিলনা। হতে পারে তাঁর প্রেম দেহজ, তবুও প্রেমই এখানে শেষ কথা। সেই শাস্বত প্রেমকেই সূর্পণখা মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী : জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার— পত্রিকাটিতে দাম্পত্য প্রেমের আলেখ্য রচিত হয়েছে। তবে এই দাম্পত্য একটু অন্যরকমের। দ্রৌপদীর পঞ্চঃস্বামী, তাদের মধ্যে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনকে তিনি বেশী ভালোবাসেন। তাঁর

অর্দশনেই দ্রৌপদী, বিরহকাতরা। দ্রৌপদীর প্রেম অনুরাগে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। দুর্বীর অভিমানের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশিত হয়েছে বারে বারে। আর তা বোঝা যায় পত্রিকার প্রথমে অর্জুনকে সম্বোধনের মাধ্যমে। দ্রৌপদী অর্জুনকে ‘ত্রিদিশলায় বাসী’ বলে সম্বোধন করেছেন। কারণ বনবাসে থাকাকালীন সময়ে অশ্রুশিক্ষার জন্য সশরীরে অর্জুন স্বর্গে যান। বহুদিন পরেও তার কোন সংবাদ না পেয়ে দীর্ঘ বিরহে আকুল হয়েছেন দ্রৌপদী এবং তিনি অভিমানের বশে বলেছেন যে স্বর্গে গিয়ে অর্জুনের বোধহয় আর মর্ত্যবাসিনী দ্রৌপদীকে মনে নেই।

স্বামী বিরহে ব্যাকুলা, অতৃপ্ত নারী দ্রৌপদীর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই পত্নীজনোচিত সন্দেহ প্রবণতা স্থান লাভ করেছে। তাঁর মনে হয়েছে, স্বর্গের সুরবালাদের সোহাগে তিনি দ্রৌপদীকে ভুলে গেছেন -

“...সতত আদরে

সেবে তোমা সুরবালা, -পীনপয়োধরা
 ঘটাসী, সু -উরু রম্ভা, নিত্য - প্রভাময়ী
 স্বয়ম্প্রভা, মিশ্রকেশ-সুকেশিনী ধনী।
 উর্বরশী-কলঙ্ক-হীনা শশিকলা দিবে।”

অনুরাগবশতঃ দীর্ঘ অদর্শনে, বিরহ যন্ত্রণা ছুট ফুট করতে করতে দ্রৌপদীর মনে নানা সন্দেহ দানা বেঁধেছে। আবার তিনি পূর্বের সমস্ত কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে, নিজেকে দুঃখী হিসাবে প্রতিপন্ন করে, তার প্রতি নিজের অকুণ্ঠ ভালোবাসার কথা জানিয়ে ফিরে আসতে অনুরোধ জানিয়েছেন। দ্রৌপদী এও জানিয়েছেন যে, ভাগ্যদোষে পঞ্চস্বামীর সঙ্গে বিবাহ হলেও তিনি মনে প্রাণে সর্বদা অর্জুনকেই চান। -

“ধনঞ্জয়! এই জানি এই মানি মনে।”

অতীতের সমস্ত ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে ধীরে ধীরে নিজের সুপ্ত মনোবাসনাকে প্রকাশিত করেছেন দ্রৌপদী পত্রিকার ছত্রে ছত্রে।

“ভালোবাসার স্মৃতি তাঁর মনকে ব্যথিত,ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। অন্য স্বামীগণের সেবা করলেও তাঁর মন পড়ে রয়েছে অর্জুনের পানে। তার স্মৃতি মাঝে মাঝেই দ্রৌপদীকে ব্যাকুল করে তোলে। ঐকান্তিক স্বামী প্রীতি, প্রেমের প্রতি নিষ্ঠা, অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হওয়ার আশঙ্কা - সবার মাঝেই প্রেমের দাম্পত্যানুরাগ বর্তমান। অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর এই প্রেমের আধিক্য ধর্ম অনুমোদিত নয়। কারণ পঞ্চস্বামীকেই সমান চোখে দেখা উচিত। কিন্তু তাঁর স্বপ্নের প্রাণপুরুষ যিনি, যৌবনাবস্থায় যাঁকে পাওয়ার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে থাকতেন, যাঁকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য তিনি প্রেমের সাধনবেদ রচনা করেছেন, ভাগ্যচক্রে তিনি স্বামী রূপে এলেন বটে, তবে আরো চার স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে। এই নির্মম ট্রাজেডি দ্রৌপদীর জীবনে নেমে এসেছে। আর তা আশ্চর্য নিপুণতায় ফুটে উঠেছে-যার সব কৃতিত্বই কবি মধুসূদনের; একদিক দিয়ে দ্রৌপদীর প্রেমাদিক্য তাকে পাপী করতে পারে। কিন্তু তাঁর ঐকান্তিক ভালোবাসা সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে। দ্রৌপদীর মধ্যে অনুরাগের যে বিচ্ছুরণ দেখা গেছে তা আন্তরিক এবং একনিষ্ঠ প্রেমের পরিচয়বাহী। অর্জুনের বিরহে কাতর দ্রৌপদী তাই অর্জুনকে ফিরে আসতে বলেছেন -

“এস ফিরি, নররত্ন! কে ফেরে বিদেশে
 যুবতী পত্নীরে ঘরে রাখি একাকিনী?”

আবার সন্দেহও প্রকাশ পেয়েছে নারীসুলভ চিত্তে। তাই তাঁর কথা মনে না থাকলেও ভাতৃত্রয়কে স্মরণ করতে বলেছেন -

“কিন্তু যদি সুরনারী প্রেম - ফাঁদ পাতি
 বেঁধে থাকে মনঃ, বঁধু, স্মর ভাতৃ -ত্রয়ে
 তোমার বিরহ দুঃখে দুঃখী অহরহ।”

তাই সবশেষে পত্র পাওয়া মাত্র ফিরে আসার কাতর অনুরোধ জানিয়েছেন দ্রৌপদী। এই পত্রে ট্রাজেডির হাহাকার যেমন আছে এখানে তেমনি অনুরাগের ছোঁয়াও আছে। প্রেমের বিরহানলে পুড়ে দ্রৌপদীর প্রেম খাঁটি সোনা হয়েছে। তাঁর

হৃদয়াবেগের কাছে সব কিছু তুচ্ছ হয়ে গেছে। অর্জুনের অনুপস্থিতিতে দ্রৌপদীর মর্মযন্ত্রণা, তাঁর প্রেম ব্যথায় বাধ্য হয়ে উঠেছে। প্রেমের রাজ্যে তিনি মহিয়সী হয়েছেন।

দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী : স্মৃতি-বেদনার মালা— সমগ্র পত্রিকাটিতে একটি ভীতি কাজ করেছে, তা হল স্বামীর পরিণাম ভীতি। রণক্ষেত্রে স্বামী দুর্যোধনের অমঙ্গল আশঙ্কায় রাজমহিষী ভানুমতী আশঙ্কিতা। মহাভারতের কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধের সময়ে ভানুমতী স্বামীর চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে গোপনে রণক্ষেত্রে স্বামীর কাছে এই পত্রিকাখানি প্রেরণ করেন। এখানে রোমান্টিক প্রেমের সুচারু কল্পনা নেই, আছে স্বামীর জন্য হৃদয় তোলপাড় করা ব্যাকুলতা ও উদ্বেগ।

প্রাসাদের উপরে উঠে যুদ্ধ দেখে ভানুমতী ভীত - সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। সঞ্জয় - অন্ধ নরপতি ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের যে বর্ণনা দেন তা তিনি শব্দের আড়াল থেকে শোনেন। তিনি এতই স্বামীর চিন্তায় চিন্তিত যে কে কী বলছেন তা যেন তিনি শুনতে পান না, বুঝতে পারেন না। স্বামীর আশু অমঙ্গল আশঙ্কায় তিনি যেন পাগলিনী হয়ে গেছেন-

‘কি যে শুনি, নাহি বুঝি - আমি পাগলিনী!’

এখানে রোমান্টিকতা হয়তো নেই, কিন্তু দাম্পত্য প্রেমের অমলিন মাদুর্য ও সৌন্দর্য অভিব্যক্ত হয়েছে। প্রেমের গতি বড় বিচিত্র। কোথাও কুমারী প্রেমের কুঁড়ি প্রস্ফুটিত হয়, কোথাও বা অনুরাগ - অভিমান, আবার কোথাও রূপজ ও দেহজ প্রেমের কামনা। আবার কোথাও দাম্পত্য প্রেমের মৌবন। সেই দাম্পত্য প্রেমেও কোথাও বা স্বামীর প্রতি অভিযোগ, তো কোথাও স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় পাগলিনী হওয়া। প্রেমে সবই সম্ভব। তাই ভানুমতীর দাম্পত্য প্রেমে কান্তা প্রেমের সুমধুর সুর যেন ধ্বনিত হয়েছে। এখানে কোন দেহজ কামনার আকাঙ্ক্ষা নেই, অকারণ ভাবুকতা নেই, যা আছে তা হল স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় এক পতিব্রতা, প্রেমময়ী স্ত্রীর উৎকর্ষা।

ভানুমতী তাই স্বামী দুর্যোধনকে উপদেশ দিয়েছেন যে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করে, প্ররোচনায় পা না দিয়ে, সৎসঙ্গ করতে। যাতে করে তিনি সুস্থ, স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে পারবেন, দুর্যোধনের বেঁচে থাকার মখেই ভানুমতীর প্রেম বেঁচে থাকবে। স্ত্রীর বা নারীর সবচেয়ে বড় অলংকার হল তার স্বামী। তাই সেই স্বামীকে বাঁচানোর জন্য অনেক পুরানো কথার প্রসঙ্গ টেনে এনে ভানুমতী দুর্যোধনকে প্রতিহত করতে চেয়েছেন। শেষে তিনি বলেছেন তিনি গতকাল রাতে কুস্বপ্ন দেখেছেন। সেখানে তিনি অনেক অকল্যাণকর, অমঙ্গলসূচক চিত্র দেখেছেন -

“বাড়িতে লাগিল লিপি, তবুও কহিব
কি কুস্বপ্ন, প্রাণনাথ, গত নিশিকালে
দেখিনু...”

এই স্বপ্ন দেখে কেঁদে জেগে উঠে তিনি বলেছেন -

“কেন এ কুস্বপ্ন, দেব, দেখাইলা মোরে?”

মনের এই যন্ত্রণাকে ভোলার জন্য স্বামীর কাছে ভানুমতী আকুল প্রার্থনা করেছেন ফিরে আসার। সকাতর আবেদন করে বলেছেন -

“এস তুমি, প্রাণনাথ, রণ পরিহরি,
পঞ্চখানি গ্রাম মাত্র মাগে পঞ্চরথী
কি অভাব তব, কহ? ...”

তাই রোমান্টিক ভাবুকতা না থাকলেও এই পত্রিকায় ভানুমতীর স্বামীর জন্য উদ্বেগ, উৎকর্ষা অন্যবিধ এক প্রেমকে চিনিয়ে দেয়। মধুর ও করুণ রসে ভানুমতীর সেই প্রেম সিক্ত হয়ে উঠেছে।

জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা : কাছে যবে ছিলে— এই পত্রিকাখানিও এক বিবাহিতা নারীর মর্মবেদনায় ভরা। মহাভারতের ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত এই পত্রিকায় ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা দুঃশলা স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। ভানুমতীর মতো তাঁর সেই একই চিন্তা। স্বামী যেন অক্ষত থাকেন।

দুঃশলা জানেন যে সকল দোষ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্ঘোষনের। তাই তিনি রাজা জয়দ্রথকে বলেছেন পাণ্ডবরাও কুটুম তারও 'সমপ্রেমপাত্র'। তাই যুদ্ধ ত্যাগ করে ফিরে আসার কাতর অনুরোধ জানিয়েছেন দুঃশলা।

ভ্রাতা দুর্ঘোষনের নানা কুকর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যুদ্ধে নিরত হতে বলেছেন স্বামীকে। রাজা দুর্ঘোষন এমন কুকীর্তি করেছেন যা নারী হয়ে তাঁর বলতে লজ্জা হয়। কেননা দুর্ঘোষন ভ্রাতৃবধু দ্রৌপদীর সম্মানহানি করেছেন, যা নারী হয়ে তিনি মেনে নিতে পারেননি। -

“তবে যদি গুণ -দোষ ধর, নরমণি, -
পাপ অক্ষত্রীড়া - ফাঁদ কে পাতিল, কহ?
কে আনিল সভাতলে (কি লজ্জা!) ধরিয়া
রজস্বলা ভ্রাতৃবধু? দেখাইল তাঁরে
উরু? কাড়ি নিতে তাঁর বসন চাহিল -
উলঙ্গিতে অঙ্গ, মারি, কুলাঙ্গয়া তিনি?
ভ্রাতার সুকীর্তি যত, জান না কি তুমি?
লিখিতে শরমে নাথ, না সরে লেখনী।”

আর তাই, রণাঙ্গণ ত্যাগ করে যত দ্রুত সম্ভব ফিরে আসার প্রার্থনা জানিয়েছেন দুঃশলা। বিশেষত, যখন তিনি শুনেছেন যে অন্যায় করে সপ্তরথী মিলে অর্জুননন্দন অভিমন্যুকে বধ করেছেন এবং অর্জুন পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা করেছেন। আগামীকালই তিনি জয়দ্রথকে বধ করবেন -

“না, বিনাশি যদি
কালি জয়দ্রথে, রণে মরিব আপনি!”

একথা শুনেই দুঃশলা মুচ্ছা যান। পরে জ্ঞান ফিরলে তিনি ভয়ানক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তার সাথে সাথে দুঃশলার মাতৃহৃদয়ও আন্দোলিত হয়েছে। জয়দ্রথ রণে নিহত হলে পুত্রের কী হবে, বা মাতা-পিতা দুজনেই হস্তিনাপুরে, পুত্র মণিভদ্র একাকী কী করছে সেকথা ভেবে মাতৃমন ব্যাকুল হয়েছে। আসন্ন বিবাহিতা রমণীর কাছে তার স্বামীই সব। তাই আসন্ন বিপদ থেকে স্বামীকে রক্ষা করতে তিনি এই পত্রিকাখানি লিখেছেন। এই লেখার মধ্যে বাস্তবতাবোধ তীব্র হলেও প্রেমের ফল্গুস্রোত অব্যাহত। তাই তিনি স্বামীকে নিয়ে ছদ্মবেশে মণিভদ্রের কাছে সিদ্ধুদেশে পালিয়ে যেতে চেয়েছেন এবং সুখের সাগরে ভাসতে চেয়েছেন। কুরু - পাণ্ডবের যা হয় হোক, তাঁর তাতে মাথাব্যথা নেই। তাঁর প্রেম বেঁচে থাকলেই তিনি তৃপ্ত। -

“এ পাপ নগর ত্যজি সিদ্ধু রাজালয়ে!
কপোতমিথুন সম যাব উড়ি নীড়ে!
ঘটুক যা থাকে ভাগ্যে কুরু পাণ্ডু কুলে।”

এক আশ্চর্য করণ লিরিকের মধুর রসে এক নারীর সুতীব্র ব্যাকুলতা দেখা গেল স্বামীকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য। আর এখানেই দুঃশলার প্রেম চিরজীবী হয়েছে। কামের উর্ধ্বে শাস্ত্র প্রেমকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, প্রেমের বীর্যে অশঙ্কিণী হতে চেয়েছেন।

শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী : প্রত্যাখানের অভাবিত আঘাত— এই পত্রিকায় জাহ্নবী মানবী নন, তিনি স্বর্গের দেবী। তাই মানবিক বেদনা, যন্ত্রণা, অনুভূতির উর্ধ্বে তিনি। এখানে প্রেমের ভিক্ষা নেই, আছে উপদেশ আর আর্শীবাদ। দাম্পত্য বন্ধন ছিন্ন করে, মানবী থেকে তিনি দেবীত্ব উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং রাজা শান্তনুর সঙ্গে দাম্পত্য রহস্যের উন্মোচন করেছেন। তিনি যে কেবল অভিশপ্ত অষ্টধনুকে উদ্ধার করার জন্যেই মর্ত্যে এসেছিলেন এবং রাজা শান্তনুকে বিবাহ করেছিলেন তা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছে। এই পত্রিকাখানিতে প্রেমানুভূতি খুবই ক্ষীণ। স্বামীর থেকে তিনি পুত্রের বেশী গুণাগুণ করেছেন। পতী প্রেমের

থেকে পুত্র স্নেহই তাঁর মধ্যে প্রকট। একজন দেবীর মধ্যে ভালোবাসার মর্মবেদনা জেগে না ওঠাই স্বাভাবিক। যিনি শুধু কর্তব্যের খাতিরেই রাজা শান্তনুকে এই চিরবিচ্ছেদ বিরহ যন্ত্রণা ভুলে যেতে বলেছেন -

“ভুলে ভূতপূর্ব কথা, ভুলে লোক যথা
স্বপ্ন - নিদ্রা, অবসানে! এ চিরবিচ্ছেদে
এই হে ওষুধ মাত্র, কহিনু তোমারে।”

তাঁদের দাম্পত্য প্রেমের চিহ্ন হিসাবে তিনি পুত্র দেবরতকে রাজার হাতে দিয়ে বিদায় নিতে চান -

“... অভিজ্ঞান রূপে
দিতেছি এ রত্ন আমি গ্রহ, শান্তমতি।”

দেবী জাহ্নবী তাকে আর পত্নী ভাবে না ভাবতে অনুরোধ করেছেন রাজা শান্তনুকে। রাজার কামনালিপ্ত মনকে তিনি ভক্তিরসে ধুয়ে পরম পবিত্র করতে বলেছেন।

“পত্নী ভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে।”

বলেছেন -

“...পূর্বকথা ভুলি
করি ধৌত ভক্তিরসে কামগত মনঃ
প্রণাম সাষ্টাঙ্গে রাজা! শৈলেন্দ্র নন্দিনী
রুদ্রেন্দ্র গৃহিণী গঙ্গা আশীষে তোমারে।”

এই কথোপকথনের মধ্যেই পত্নী জাহ্নবী হঠাৎ দেবীত্বে উত্তীর্ণ হয়েছেন। রাজাকে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি হরপ্রিয়া রুদ্রেন্দ্র গৃহিণী, তিনি রাজাকে আর্শীবাদ করেছেন।

তবে এত কিছু মধ্যও জাহ্নবীর মধ্যে একটা প্রীতিপূর্ণ ভাব ছিল। তিনি দেবী, তাই সমস্ত মানবিক গুণের উর্দে। কোনো মানবিক দুর্বলতাই তাঁকে ছুঁতে পারেনি। তবে দীর্ঘদিন দাম্পত্য জীবনযাপন করার ফলে কিছু সূক্ষ্ম মানবিক জাগরণ হয়তো তাঁর মধ্যে হয়েছিল। দাম্পত্য বন্ধন খণ্ডন করলেও তাঁর সেই সূক্ষ্ম অনুভূতি হারিয়ে যায়নি। তাই এত কিছু মধ্যও পত্রিকাটি একেবারে প্রেমানুভূতি বঞ্চিত নয়, রাজাকে উপদেশ দেওয়ার সময়ই জাহ্নবীর হৃদয় বারে বারেই উন্মোচিত হয়েছে-

“যতদিন ছিনু তব গৃহে
পাইনু পরম প্রীতি! কৃতজ্ঞতা পাশে
বেঁধেছ আমাকে তুমি...”

আবার বলেছেন -

“অন্তরীক্ষে থাকি
তব পুরে, তব সুখে হইব হে সুখী
তনয়ের বিধুমুখে হেরি দিবানিশি।”

দীর্ঘদিন রাজা শান্তনুর সঙ্গে বসবাস করার ফলে জাহ্নবীর মধ্যে মমতাবোধ জন্মেছিল। তাই তিনি বিদায় নিলেও অন্তরীক্ষ থেকে পুত্রের মুখ দর্শন করে প্রেমের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছেন।

পুরুরবার প্রতি উর্বশী : বাঁশী বাজে বনমাঝে, না মনোমাঝে— যে অনন্তযৌবনা, সুন্দরী শ্রেষ্ঠা, লাস্যময়ী স্বর্গনারী উর্বশীকে পাওয়ার জন্য মর্ত্যপুরুষেরা আকুল, যুগযুগ ধরে যাকে পাওয়ার জন্য মর্ত্যপুরুষেরা স্বপ্ন দেখেছেন, কিন্তু তিনি অধরাই থেকে গেছেন, সেই উর্বশীই কিনা শেষে মর্ত্যপুরুষের প্রেমে পাগল হয়ে গেলেন। সেই চির অধরা উর্বশীই প্রেমাবেশে মর্ত্যপুরুষের গৃহে গৃহিণী সহচরী, মর্মসঙ্গিনী হয়ে ধরা দিতে চাইলেন। তাঁর সেই মনের কথা জানাতেই তিনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত পুরুষ রাজা পুরুরবাকে এই পত্রিকাখানি প্রেরণ করেছেন।

পত্রিকার প্রথমেই উর্বশী তাঁর প্রেমে পড়ার ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। কেশী নামক দৈত্য কর্তৃক অপহৃত হওয়ার পর কীভাবে রাজা পুরুরবা বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে তাঁকে উদ্ধার করেছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন উর্বশী। সেই যুদ্ধে রাজা পুরুরবার পুরুষোচিত বীরত্ব ও সাহস দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। এছাড়া রাজার অপরূপ রূপলাবণ্য দেখে উর্বশী রাজার প্রতি মোহিত হয়ে যান। রাজাও স্বর্গের এই পরমাসুন্দরী দেব নর্তকীকে দেখে বিমোহিত হন। এখান থেকেই উর্বশীর মনে প্রেমের পূর্বরাগ সঞ্চিত হয়। তা তিনি যত্নে মনের গোপনে লালন করে চলেছিলেন। ঘটনাসূত্রে একদিন তাঁর সেই কাঙ্ক্ষিত ফললাভের দিন এসে যায়। দেব সভায় নাট্যস্থলে ভুল সংলাপ উচ্চারণ করেন। দিবারাত্র উর্বশী তাঁর কথা স্মরণ করেন, প্রেমাবিষ্ট হয়ে তিনি স্থান-কাল-পাত্র ভুলে তাঁর নামই উচ্চারণ করেন - “রাজা পুরুরবার প্রতি!” রাজার প্রতি তাঁর মন সর্বদা ধাবমান। আর এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে নাট্যাচার্য ভরতমুনি তাঁকে শাপ দেন, যে মর্ত্যবাসী পুরুষের প্রতি উর্বশীর মন পড়ে আছে, সেই মর্ত্যই তাকে জন্মগ্রহণ করতে হবে। উর্বশী স্বর্গচ্যুত হলেও তাঁর মনে কোন দুঃখ ছিল না। কারণ আজ তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হতে চলেছে। যে বাধ্যবাধকতায় তিনি তাঁর চিরকাঙ্ক্ষিত পুরুষকে তাঁর প্রেমের অঞ্জলি দিতে অক্ষম ছিলেন, আজ সেই সুযোগ এসেছে। তাই বলতে গেলে উর্বশীর শাপে বর-ই হয়েছে। আর সেই কথা জানিয়েই প্রেমাবেশে এই পত্রিকাখানি রাজাকে সখী চিত্রলেখার মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন।

প্রেমের আর এক বিচিত্র চিত্র এই পত্রিকায় রূপ পেয়েছে। এক স্বর্গ নর্তকী মর্ত্য মানবের প্রেমে ধরা দিয়েছেন। রাজা পুরুরবার পদতলে ‘কায়মনঃ’ নিবেদন করেছেন উর্বশী। যার কাজই হল দেবতাদের হৃদয় মনকে সবল রাখা, তিনিই কি না মর্ত্য মানবের প্রেমে পাগল। এক্ষেয়েমি জীবন থেকে পালিয়ে নিত্য পরিবর্তনশীল বৈচিত্র্যময় মর্ত্যে প্রেমের স্বর্গ গ্রহণ করার জন্য তিনি বুভুক্ষু। তাই তিনি রাজা পুরুরবার কৃপা প্রার্থনা করেছেন; রাজার সঙ্গে মর্ত্যে ঘর বাঁধতে চেয়েছেন, পিঞ্জর ভেঙে বেরিয়ে এসে স্বর্গের সুখও উর্বশীর কাছে ক্ষীণ হয়ে গেছে। পুরুরবার প্রেমের জন্য -

“... ও চরণে রত এমন!

এ মন! উর্বশী, প্রভু, দাসী হে তোমারি!

ঘৃণা যদি কর দেব, কহ শীঘ্র শুনি।

...

...যদি কৃপা কর,

তাও কহ, যাব উড়ি ও পদ আশ্রয়ে

পিঞ্জর ভাঙিলে উড়ে বিহঙ্গিনী যথা

নিকুঞ্জ! কি ছার স্বর্গ তোমার বিহনে?”

স্বর্গের সমস্ত সুখৈশ্বর্য, অনন্ত মাধুর্য ত্যাগ করে, তুচ্ছ জ্ঞান করে উর্বশী প্রেমিকের পদতলে জীবন সমর্পণ করেছেন। এখানে উনিশ শতাব্দীর নারী জাগৃতির চেতনা ফুটে উঠেছে। নারীর স্বাধীন প্রেম চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। সামাজিক বন্ধন কেটে প্রেমের জয়গান গাইতে চাওয়া হয়েছে।

উর্বশীর প্রেমে রূপজ মোহও দেখা যায়। জ্ঞান ফিরে পেয়ে প্রথম দর্শনেই উর্বশী পুরুরবার রূপের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। -

“পাইনু চেতন যাবে, দেখিনু সম্মুখে

চিত্রলেখা সখী সহ ও রূপমাধুরী

দেবী মানবীর বাঙ্গ! উজ্বল দেখিনু

দ্বিগুণ, হে গুণমণি, তব সমাগমে

হেমকূট হৈমকান্তি - রবিকরে যেন!”

উদ্ধৃত চরণ থেকেই উর্বশীর রূপমুগ্ধতা অনুভব করা যায়। এছাড়া খুব সূক্ষ্মভাবে হলেও উর্বশী তাঁর দেহজ আকর্ষণের কথাও উল্লেখ করেছেন। তবে তা খুবই স্বাভাবিকভাবে। তাই তাঁর প্রেম ঐকান্তিক হয়ে উঠেছে। কামের গন্ধ

এখানে তেমন নেই। তবে তাঁর অনন্ত ‘যৌবন সুধা’ ভোগ করার জন্য যে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালবাসী হাহাকার করে সেই দেহসুধা তিনি রাজার পদে অর্পণ করতে প্রস্তুত -

“কঠোর তপস্যা নর করি যদি লভে
স্বর্গ ভোগ, সর্ব অগ্রে বাঞ্ছে সে ভুক্তিতে
যে স্থির - যৌবন - সুধা অর্পিবে তা পদে!
বিকাইব কায়মনঃ উভয়, নৃমণি
আসি তুমি কেন দোঁহে প্রেমের বাজারে!”

দেবতাদের চির আকাঙ্ক্ষিত কামসঙ্গিনী তিনি। তাঁর মধ্যে কামভাব জাগ্রত হওয়াই স্বাভাবিক। তবুও মর্ত্য মানবের প্রেম লাভে তাঁর ঐকান্তিকতাই ফুটে ওঠে। যে কাম বিষে উর্বশী জ্বলতেন, আজ মুনির অভিশাপে সেই বিষ নির্বিষ হতে চলেছে। পুরুরবার প্রেমের আঙুনে পুড়িয়ে তিনি নিজেকে খাঁটি সোনা পরিণত করতে চেয়েছেন। এখানেই উর্বশীর প্রেম শ্রেষ্ঠ এবং সার্থক হয়ে উঠেছে।

“বিষের ওষুধ বিষ, শুনি লোকমুখে।
মরিতেছি নৃমনি, জ্বলি কামবিষে
তেই শাপবিষে বুঝি দিয়াছেন ঋষি
কৃপা করি! বিজ্ঞ তুমি, দেখ হে ভাবিয়া।”

এই ভাবনার মধ্য দিয়ে রাজা পুরুরবাকে তাঁর পদে আশ্রয় দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন উর্বশী। তাঁর প্রেম যে সফলকাম হবে তাও তিনি জানিয়েছেন। ‘সুপ্রফুল্লফুল’ তাঁর মাথায় আর্শীবাদ স্বরূপ পড়েছে এবং হরপ্রিয়ায় মন্দাকিনী তাঁর কানে কানে বলে গেছে - “তুই হবি ফুলবতী” মর্ত্য মানবের প্রেমকেই উর্বশী তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রেম বলে মনে করলেন। আর মর্ত্য মানবের আর এক বিচিত্র প্রেমকে উর্বশীর প্রেমের মধ্যে দিয়ে কবি মধুসূদন শ্রেষ্ঠ প্রেমের স্বীকৃতি দিলেন।

নীলধব্বজের প্রতি জনা : জননী যন্ত্রণা প্রেমের ভজনা— সন্তান হারা শোকাতুরা এক মায়ের বুক ফাটা আতর্নাদ ধ্বনিত হয়েছে এই পত্রিকায়। ‘বীরাজনা’ কাব্যের চতুর্থ স্বর্গের সঙ্গে এই স্বর্গের আপাত কিছু মিল থাকলেও অন্তরঙ্গে কোনো সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। দুই সর্গেই মাতৃহৃদয় ব্যাকুল হয়েছে - কেকয়ী ও জনা। কেকয়ীর মত প্রতিবাদী হলেও তিনি কামমোহিত নারী নন। এখানে স্বামীর সঙ্গে জনার মূল বিরোধ আদর্শের। পুত্রহন্তাকে সম্মান জানানোয় পত্নীর ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। পুত্র শোকাতুরা হলেও তাঁর সবচেয়ে বড় দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াল যখন তাঁর স্বামী রাজা নীলধব্বজ তাঁর পুত্রহন্তাকারীর সঙ্গে সন্ধি করেছেন তখন। এই মিত্রতা, আপ্যায়ন, কিছুতেই রাণী জনা মানতে পারেননি। তাই ব্যঙ্গ, বিদ্রুপে তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন।

মাতৃহৃদয়ের চরম শোক, ক্ষোভ এবং আত্মমর্ষাদাজ্ঞান প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকাখানিতে। রাজা নীলধব্বজ যখন পুত্রহন্তাকারীকে যুদ্ধে পরাস্ত না করে তাঁর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেছেন তখনই ক্রোধে, ক্ষত্রিয় রোষে জ্বলে উঠেছেন রাণী জনা। পুত্র শোক ভুলে তিনি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠেছেন, আত্মপীড়িতা হয়েছেন। তাঁর আর কোন আশ্রয় নেই। আত্মহনন ছাড়া তাঁর আর কোন উপায় নেই।

“প্রাকৃতিক কারণ দুর্বল এবং প্রচলিত সামাজিক কবিদের অধিকার গত বৈষম্যের শিকার হয়ে নারীর স্বাধীন ইচ্ছাপূরণের সুযোগ নেই। নির্ভর করার মতো দুটি অবলম্বনের জায়গাও জনা হারিয়েছেন। তাঁর পুত্র মৃত। আর স্বামী বিকাকের ঘোরে আত্মবিস্মৃত। এ অবস্থায় জনা কোন পথ খুঁজে পাননি। ভিতরে আছে ক্ষত্রিয় নারীর মর্ষাদা বোধ। অন্যায়কে ধৈর্যসহ মেনে নেওয়ার নীতিতে তাঁর অবস্থা নেই। সুতরাং অবমাননার সমমোতার বিলাপ হিসাবে এইমাত্র মৃত্যুই তাঁর বাঞ্ছিত।”^৭

তাঁর শোকান্বিত কেবল পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধেই নিভতে পারে -

“প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে

নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাল্গুনির লোহে?”

স্বামীকে পত্রিকা প্রেরণ করে এই কথাই জানাতে চেয়েছেন জনা। পুত্রশোকে অন্ধ হয়ে তিনি রাজাকে ধিক্কার জানিয়েছেন। রাজার কার্যে তিনি লজ্জিত –

“কি লজ্জা! দুঃখের কথা, হায় কব কারে?
হতজ্ঞান আজি কি হে পুত্রের বিহনে
মাহেশ্বরী – পুরীশ্বর নীলধব্বজ রথী?”

স্বামীর প্রতি অভিমান করে, পুত্রের শোকে আকুল হয়ে জনা অর্জুন, তাঁর মাতা কুন্তী, পত্নী দ্রৌপদী, মহাভারতের মহামুনি ব্যাসদেব কাউকেই ছেড়ে কথা বলেননি। বিষময় বাক্যবাণে তাঁদের কর্মের কথা বলে তাদের স্বৈরীণী, কুলটা, মিথ্যাবাদী বলেছেন।

তবে স্বামীর প্রতি মান-অভিমান, ক্ষত্রিয়রোষ, ক্ষোভে, পুত্র শোকাচ্ছাসে জনা যাই বলুন না কেন, স্বামীর প্রতি তাঁর যে প্রেম ছিল তা তাঁর মুখ থেকেই শোনা যায়। পত্রিকাখানি এক পুত্রহারা মায়ের হাহাকারে ধ্বনিত হলেও পত্রিকার শেষে অভিমানবশত স্বামীপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে। –

“কিন্তু বৃথা এ গঞ্জনা। গুরুজন তুমি
পড়িব বিষম পাপে গঞ্জিলে তোমারে।
কুলনারী আমি, নাথ, বিধির বিধানে
পরাদীনা!”

পতিপ্রেমের পাশাপাশি এখানেও সেই ঊনবিংশ শতকের নারীর স্বাধীনতা হীনতার ছবি ফুটে উঠেছে। নারী যে পরাদীন, পিঞ্জরাবদ্ধ ময়না তা উদ্ধৃত উক্তি থেকেই বোঝা যায়।

জনা তাঁর নিজের ভাগ্যকে দোষ দিয়েছেন। পতি প্রেম জাগ্রত থাকলেও পুত্রশোকে আকুল হয়ে, পতির প্রতি অভিমানে তিনি বেঁচে থাকতে চান না।

“তুমি পতি, ভাগ্যদোষে বাম মম প্রতি
তুমি! কোন্ সাধে প্রাণ ধরি ধরাধামে?”

রাজ্ঞী জনার মন তাই এ ধরাধাম সম্পর্কে শূন্যতা জাগলেও প্রেমের অপরূপ মাধুর্য প্রকাশ পেয়েছে বেশ কিছু ছন্দে, বা পতিপ্রেমের পরিচয় বহন করে। প্রচণ্ড অভিমানে পত্রিকার শেষে তাই জনা বলেছেন –

“... যাচি চির বিদায় ও পদে!
ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি,
নরেশ্বর, কোথা জনা? বলি ডাক যদি
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি কোথা জনা? বলি!”

এ উক্তিই জনার প্রেমের স্বরূপ ধরা পড়ে। তবে পুত্রের শৌর্যগৌরব, বীরত্ব, ক্ষোভ, রোষ, আত্মমর্যাদাবোধ এই পত্রিকায় প্রেমকে ছাপিয়ে গেছে। মাতৃহৃদয়ের আকুলতাই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। আবার রাজা নীলধব্বজের কাপুরুষোচিত আচরন রানীকে দুঃখ দিলেও অভিমানী পত্নীর পতিপ্রেমের এক আশ্চর্য প্রতিধ্বনি ধ্বনিত হয়েছে পত্রিকাটিতে।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পথপ্রান্তে, বিচিত্রা প্রবন্ধ, পৃ. ৮৫
২. সিফনি, ভূমিকা : সুকুমার ঘোষ
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সবলা, মহুয়া, পৃ. ১১২

-
৪. চট্টোপাধ্যায়, তপন কুমার, কবি মধুসূদন ও বীরাজনা কাব্য, প্রবন্ধ বিচিত্রা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০৫, পৃ. ১৬৮
৫. তদেব, পৃ. ৮৯
৬. মজুমদার, উজ্জ্বল কুমার (সম্পাদঃ), মধুসূদনের কেকয়ী : নারী নয়, বহি, অচিন্ত্য বিশ্বাস, বীরাজনা কাব্যচর্চা, সোনার তরী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ২০০৭, পৃ. ২১৬
৭. মজুমদার, উজ্জ্বল কুমার (সম্পাদঃ), নীলধ্বজের প্রতি জনা : একালের নবপুরাণ, বীরাজনা কাব্যচর্চা, পৃ. ২৭৮ সোনার তরী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ২০০৭, পৃ. ২৭৮